Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page No. 18-24
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাসাহিত্যের দেশভাগ ও মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন

ড. মাম্পি বৈদ্য

Abstract

Division of country doesn't include only political or geographic division, it also pull out all division of society, culture and also sentiments of peoples of that country. This events leads to more painful as because freedom is associated with the division of country. Narendra Mitra's novel narrates the direct effects of division towards people of the country. He narrated all sentiments of people, their feelings, and problems during freedom fight.

Narendra Mitra was a writer, whose lifespan was from 1916-1975. During this period, whole country was under threats of world war. Starvation and riots made more measurable around the country. For that reason Narendra Mitra's novel narrates multiple times the problems of all villages and towns due to the division of country. He narrated all consequences of division and also compared before and after division. During this period, many families were homeless due to shifting on the basis of religious division, many were left behind their property to save their lives. Many miss happening was also there to ladies by inhuman brutality behaviour of bad people. Some people spent beggar like situation after shifting and settled down at Shiyalda railway station. The loss of property during division made people to occupy others property in illegal way at Bangal. All immigrants were facing problems of unemployment. Even Starvation made worst during this periods. All these situations was beautifully narrated by Narendra Mitra's novel. He put all scenario of that period in his novel.

প্রায় দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন অন্তে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ভারত তা ছিল খণ্ডিত এবং সমস্যা সঙ্কুল। ভারতীয় উপমহাদেশকে দু'ভাগ করে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হল ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র। জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজনের ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে এলেন ভারতে, ভারতের মুসলমানরা অনেকেই চলে গেলেন পাকিস্তানে। এই যাওয়া আসার আসার প্রক্রিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। বহু উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, অত্যাচার সহ্য করে পাঞ্জাবে এ পশ্চিমবঙ্গে আসতে পেরেছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন। স্বভূমিহারাবার যন্ত্রণার সঙ্গেই অত্যাচারিত হবার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁদের সঙ্গী। এত বড়ো একটি ঘটনা সাহিত্যে তার চিহ্ন রেখে যাবে – এটাই স্বাভাবিক। যদিও বাংলা সাহিত্যে এই বিপুল আলোড়নের খুব বেশি প্রতিফলন হয় নি বলে অনেকে মনে করেন, মনে করেন, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা রূপায়িত হয়েছে এমন লেখাও কম নয়, যেমন— উপন্যাস, ছোটোগল্প, স্মৃতিকথা ইত্যাদি।

আমরা জানি যে, বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতভাগ এই উপমহাদেশের বৃহত্তম ট্রাজেডি। একটা দেশভাগ হওয়া মানে কেবল রাজনৈতিক বা ভৌগলিক নয় ভাগ হয়ে গেছে সমাজ, সংস্কৃতি, দ্বিখণ্ডিত হয়েছে মানুষের মন। এ ঘটনাটা আরও মর্মান্তিক কারণ স্বাধীনতার আনন্দের সঙ্গেই মিশে আছে দেশভাগের বেদনা। বিভাজনের প্রত্যক্ষ আঘাতটা যাদের উপরে পরেছিল, সেই সব আশ্রয়ছিন্ন মানুষের মনে কেমন ছিল এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া, কীচোখে দেখেছিল তারা স্বাধীনতাকে। তাঁদের সেই সংকট, সংগ্রাম, বেদনা ও বিপর্যয়ের কাহিনিই আমরা দেখার চেষ্টা করেছি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) চল্লিশের দশকের লেখক বলেই পরিচিত। চল্লিশের দশক এমন একটা সময় যখন পৃথিবী জুড়ে বিশযুদ্ধের বিভীষিকা, ভারত জুড়ে মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগের ভয়াবহ পরিণতি। তাই এটাই স্বাভাবিক যে তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে আসবে দেশভাগের ফলে শহর ও গ্রামের জীবন যাত্রায় প্রবল সংকটের ছবি। তবে নরেন্দ্রনাথ সেই অর্থে রিফিউজি নন, তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে হলেও তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই, এ পাশ করার পর কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ ক্লাসে পড়াশুনা শুরু করেন। থাকতে শুরু করেন বড়বাজার শিয়ালদহ মোড় থেকে কিছু দূরে মঙ্গলা লেনে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। চার বছর জব্বলপুরে কর্মসূত্রে থাকা ছাড়াও তাঁর বাকী জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে কলকাতার নানা ঠিকানায়। দেশভাগের ফলে ওপার বাংলার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু যখন আছড়ে পড়েছিল এপার বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ও কলকাতার উপান্তে, সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ শরিক তিনি ছিলেন না, বরং বলা যায় কলকাতার সেই এলোঝড়ের দিনগুলির তিনি ছিলেন অসহায় দর্শক। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি যথার্থ—"ঔপনিবেশিক শিক্ষা নরেন্দ্রনাথকে খুব বেশি ছিন্নমূল করতে পারেনি। বাল্য ও কৈশোরের গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা, গ্রামজীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে নরেন্দ্রনাথ কখনই ভোলেননি।"[১]

তাঁর কথাসাহিত্যে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা কিছুটা স্থান অধিকার করে আছে। কিছুটা বলার কারণ এই যে, তাঁর বেশিরভাগ লেখায় দেশভাগ ও উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সংকটের ফলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া উঠে এসে মানুষের জীবনের নানা সামাজিক ও মানসিক অশান্তি ও সমস্যা। এই প্রসঙ্গে সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর একটি মতামত উল্লেখযোগ্য— "কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে হয়তো সবচেয়ে বেশি এ বিষয়ে লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ। সমস্যার নানা বিচিত্র ও মানবিক দিক তুলে ধরেছেন তাঁর কলমে।"[২]

তবে একজন লেখক যখন এরকম একটি ভয়াবহ ঘটনার দর্শক হন, তিনি তো তখন শুধু একজন দর্শক মাত্র থাকেন না, সেই ঘটনা ছবির পর ছবি হয়ে ওঠে একজন লেখকের অভিজ্ঞতা, পরবর্তী দিনগুলিতে তিনি সেই অভিজ্ঞতা ধরে রেখেছেন একের পর এক গল্পে ও কোন কোন উপন্যাসে।

দেশভাগের প্রভাব ও দেশে, বিশেষ করে কলকাতার উদ্বাস্তু জীবনের চরম দুর্দশা নিয়ে লেখা অসংখ্য গল্প নিয়ে আলোচনার পরিসর এখানে না থাকলেও বরং কয়েকটি গল্প বেছে নিয়ে আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি নরেন্দ্র মিত্র কী চোখে দেখেছিলেন সেই আগুনে পোড়া দিনগুলি, তাঁর লেখনীতে কীভাবে এঁকেছিলেন সেই তীব্র দহনের চেহারা।

আমাদের দেশে সাহিত্যের মহিমা বিচার করা হয় তার চলচ্চিত্র রূপ দেখার পর, যেমনটি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' একসময় সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে পৌছে গিয়েছিল বিশ্বের দরবারে। তেমনি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' একদিন বিখ্যাত হয়ে উঠল সত্যজিৎ রায়ের ক্যামরায় 'মহানগর' এর রূপ ধরে। এ বিষয়ে স্বয়ং লেখক বলেছেন— "মহানগর আদিতে ছিল 'অবতরণিকা'। চোদ্দ-বছর আগে (১৩৫৬) 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' পূজা সংখ্যায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় তারপর 'চড়াই-উৎড়াই গল্প সংকলনে অপরিবর্তিত আকারে লেখাটি গ্রন্থভুক্ত করি। সম্প্রতি 'অবতরণিকা'কে স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ছায়াচিত্রে রূপ দিয়েছেন 'মহানগর' নামটি

তাঁরই দেওয়া'' [৩] অবতরণিকা গল্প প্রথমেই উচ্চারণ করলাম এই কারণে যে গল্পটি দেশভাগের বলি এক দম্পতি সুব্রত - আরতির সংসার স্বভাবতই আর্থিকভাবে অসচ্ছল। বৃদ্ধ বাবা-মা ও তিনটি ভাই বোনের সংসার নিয়ে সুব্রত খুবই বিপর্যস্ত। একার রোজগারে পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে অপারগ হওয়ায় সে বাধ্য হয়ে স্ত্রী আরতিকে বলে চাকরি নিতে, যাতে সংসারে একটু সুরাহা হয়। আরতি একটি চাকরি জোগাড় করে, সেলস এর চাকরি, যে চাকরিতে আরতির সুন্দর মুখ ও শরীর কাজ করে কোম্পানির প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন হিসাবে। আরতির কাজ উলেন মেসিনের ব্যবহার শিখে শহরের অন্য বাড়িতে গিয়ে সেই মেশিনের ব্যবহার শিখিয়ে আসা।

আরতির চাকরি সংসারে স্বচ্ছলতা আনলেও এক অন্য জটিলতার সৃষ্টি হয় সুব্রত ও আরতির দাম্পত্য জীবনে। সুব্রতর মনে হয় আরতি আর তত মনোযোগ নেই সুব্রতর উপর যতটা ছিল চাকরি যোগদানের আগে। সুব্রত খুঁজতে থাকে আরতির এই অমনোযোগের কারণ। গল্পটিতে পূর্ববাংলা থেকে চলে আসা এক রক্ষণশীল পরিবারে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই যখন বাড়ির বউ চাকরি নেয় তখন পরিবারের পুরুষেরা কীভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যে সুব্রতকে বলতে শুনি—'পুরুষ হোক, মেয়ে হোক আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারোর'[৪]। সেই সুব্রতর মুখে শুনতে পাই - তোমাকে হয় চাকরি ছাড়তে হবে নয়তো আমাকে।' যদিও সুব্রত একদিন আরতির অফিস গিয়ে আবিস্কার করে তার ম্যানেজার আরতিকে এমন খাটায় যার ফলে আরতি যখন ঘরে ফেরে তার শরীর ও মনে একটুও ভালোবাসা থাকে না। সুব্রত বোঝে আরতির ম্যানেজার তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আরতির শ্রমের দাবিদার। পরে আরতি চাকরি ছাড়ে ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে— আরতির সহকর্মী এডিথের নামে মিথ্যে চরিত্র হননের অভিযোগ আনে ম্যানেজার, তার প্রতিবাদে। সুব্রত আরতিকে বলে সে নিতান্তই সেন্টিমেন্টাল বাঙালি মেয়ে। তার উত্তরে আরতির অভিমানী কণ্ঠ জ্বলে ওঠে; তুমি, তুমিও তাই বলছ!

এই গল্পের সঙ্গে দেশভাগের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই, তবে দেশভাগের ফলে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে কীরকম সংকট ঘনিয়ে আসে তার উদাহরণ এই গল্পটি।

তবে নরেন্দ্র মিত্রের অন্য একটি বিখ্যাত গল্প 'পালঙ্ক' সরাসরি দেশভাগকে কেন্দ্র করেই রচিত। দেশভাগের পরেও রাজমোহন থেকে গেছেন পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু তাঁর পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন চণ্ডীপুরের অম্বিকা বোসের নাতনির সঙ্গে তারা বেলাঘাটের ভাড়াবাড়িতে দিন অতিবাহিত করেন আর্থিক সংকটের মধ্যে। দেশভাগের কারণেই এই সংকট। অর্থকষ্টের কারণেই রাজমোহনের পুত্রবধূ অসীমা শ্বশুরকে জানায় পূর্ব পাকিস্তানে রেখে আসা তার বাপের বাড়ির দেওয়া পালঙ্কটি বিক্রি করে কলকাতায় টাকা পাঠাতে আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় যাবতীয় টানাপোড়েন। অপমানিত রাজমোহন পালঙ্কটা বার করে দিয়েছে, সে দেশের মকবুল পালঙ্কটি কেনে। প্রবল উত্তেজিত হয়ে পালঙ্কটি বিক্রি করার পর রাজমোহন উপলব্ধি করেন তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল, তাঁর পৌরুষেই আঘাত লাগায় তিনি আবার ফিরে পেতে চান পালঙ্কটি, কিন্তু মকবুল বলে, ওই পালঙ্ক হল তার 'পুরুষের ত্যাজ'। মকবুলের প্রত্যাখ্যান আরও উত্তপ্ত করে তোলে রাজমোহনকে। অপেক্ষাকৃত রাজমোহন চেষ্টা করেন মকবুলকে হেনস্থা করতে। রাজমোহনের সঙ্গে মকবুলের লড়াইয়ে রাজমোহন ক্রমশ পর্যদুস্ত করে তোলেন মকবুলকে। ফতুর মকবুলের স্ত্রী ফতেমা বলে ওঠে, 'শুনি এখন তো আমাগো পাকিস্তান। আমাগো মোসলমানের রাজত্ব। এখন আমরা না খাইয়া মরব ক্যান? মকবুলের সন্তানরা ওই পালঙ্কের অধিকার পেয়েছে তা রাজমোহনের কাছে এক প্রবল অপমান, তিনি মকবুলের কাছ থেকে যে-করেই হোক ফিরে পেতে চান পালঙ্কটা। কয়েক মুহূর্তের ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আঘাত হেনেছে তাঁর মর্যাদায়।

হঠাৎ একদিন পড়শি কালুর মুখে শুনলেন মকবুল বিক্রি করে দিচ্ছে পালঙ্কটা, শুনে আর ও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রাজমোহন, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে, জ্বরের ঘোরে কাবু রাজমোহন সেই রাতেই হাজির হন মকবুলের বাড়িতে, কিন্তু গিয়ে শোনেন মকবুল বলছে আতজদ্দি দেড়শটাকার উপরে আরও দশটাকা বেশি দিতে চাওয়াতেও সে বিক্রি করতে রাজি হয়নি পালঙ্কটি।

গল্পটাতে দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হওয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে টানাপোড়েন ও মান বজায় রাখার এক লড়াকু ছবি। কাঠগোলাপ' আরেকটি গল্প যেখানে দেশভাগের নির্মমতার বলি নীরদ ও তার স্ত্রী অনিমাকে নিয়ে। ওঠে কলকাতার এক ভাড়াবাড়িতে নীরদ যা বেতন পায় তাতে তার পক্ষে কলকাতার স্ট্যাটাস বজায় রাখাটা মুশকিল, কিন্তু অনিমা তাদের অভাব সত্ত্বেও লোককে অহেতুক বড়োলোকোমি দেখিয়ে সুখ পায়। তার এক বন্ধু তিলোত্তমা থাকে টিনের ঘরে শুধু ভিতটা পাকা, কিন্তু ভিতরে আলো নেই, এমন স্যাঁতসেতে। অনিমা থাকে শহরে, রাজার হালে। সেই কারণে অনিমা নিজেকে মনে করে রাজধানীর রাণী, সম্রাজ্ঞী। বাইরের লোক কে চা খাইয়ে বোধ করে আভিজাত্যের অহংকার। স্বামীর অজান্তে কিনে ফেলে একুশ টাকা দামের শাড়ি। বলে, শহরে এলে এসব করতেই হয়, না করলে লোকে নিন্দে করে।

যথেষ্ট রেস্তহীন অনিমা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কলকাতা ঘুরতে, উঠে বসে ডাবল ডেকারের দোতালায়, বলে মাঝে মাঝে ট্রাম- বাসে না উঠলে শহরে আছি মনেই হয়না। আর কি চমৎকারই না লাগে দোতলা বাসের সামনের সিটগুলিতে গিয়ে বসলে। দোতলা বাস পেলে একতলা বাসে উঠি না। বেশ লাগে চলন্ত বাসের চূড়ায় বসে দুদিকের দোকান পাট, মানুষজন দেখতে।

অনিমার এই উচ্চারণের পিছনে রয়েছে উচ্চাসা, গরিব হওয়া সত্ত্বেও তার লোক দেখানো অহংকার আসলে সে বোঝাতে চায় তারা ওপার বাংলার এক বিত্তবান ঘরের মানুষ, এপারে এসে ও তাদের বিত্ত কম নেই।

দেশভাগের কথা বলতে গেলে নরেন্দ্র মিত্রের এক অন্য বিখ্যাত গল্প 'হেডমাস্টার' এর কথা। কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার ছিলেন পূর্বঙ্গের সাগরপুর এম.ই স্কুলের হেডমাস্টার। স্কুলটি সরকারি সাহায্য পেত মাত্র পঞ্চাশটাকা। তবে কৃষ্ণ প্রসন্ন সরকারের অন্য রোজগার ছিল স্কুলের সেক্রেটারি নিত্যনারায়ণবাবুর বাড়িতে পয়ঁত্রিশটাকার টিউশনি। নিজের পেশায় তিনি ছিলেন খুবই সন্তুষ্ট। কিন্তু দেশভাগের ফলে তাঁর জীবনে নেমে এল চরম বির্পযয়। আরও বহু মানুষের মতো স্কুলের সেক্রেটারি নিত্যনারায়ণবাবু দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন পাকিস্তান ছেড়ে। টিউশনি চলে যেতেই খুব বিপাকে পড়লেন প্রসন্নবাবু। বাধ্য হয়ে স্ত্রী লাবণ্যলতা ও কন্যা গীতাকে নিয়ে তিনি ও চলে এলেন কলকাতার হরিশ চ্যাটার্জি রোডের এক কলোনি বস্তিতে। কলকাতা এসে বেকার কৃষ্ণপ্রসন্ন তখন খুব আতান্তরে, কীভাবে সংসার চালাবেন ভেবে কুল পাচ্ছিলেন না, অবেশেষে যোগাযোগ করলেন তাঁরই এক কৃতী ছাত্র নিরূপম নন্দীর সঙ্গে। নিরূপম ১৯৩২সের ব্যাচে জেলায় ফার্স্ট হওয়া ছেলে, স্কলারাশিপ পেয়ে সুনাম অর্জন করেছিল ওদেশে। এখন কলকতার রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত।

প্রসন্ন সরকার গেলেন তার সেই ছাত্রেই কাছে চাকুরির সন্ধানে।

বহুকাল পরে শিক্ষকের সঙ্গে কৃতী ছাত্রের। দুজনের মধ্যে শুরু হল স্মৃতি রোমন্থন ও নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প। অবশেষে তার কাছে চাকরির প্রার্থনা জানাতে ছাত্র তার শিক্ষককে নিয়োগ করল কেরানির পদে। কিন্তু হেডমাস্টার এমন একটি পদ, মানুষ গড়ার কারিগর যিনি তার পক্ষে কেরানির জীবন মানিয়ে নেওয়া কঠিন। একজন প্রধান শিক্ষকের নীতিবোধ, দায়িত্বজ্ঞান অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। ছিল তাঁর মানুষ গড়ার আনন্দ। সেই মহান জীবন ছেড়ে কলকাতায় এসে হাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু কিছু তো করার নেই, উদরপূর্তির তাগিদে বহাল হতে হয়েছে পঁচাশিটাকার চাকরিতে।

তবে জীবন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বদলাতে হয় মানুষকে। কলকাতার জীবনে সামিল হয়ে তিনি নিজেকে বদলে দিতে চাইছেন, আর সেই পরিবর্তন নজর এড়ায়নি ছাত্র নিরূপমের। তিনি যখন হেডমাস্টার ছিলেন তিনি থাকতেন সদা ব্যস্ত, নিজের স্কুল নিয়ে এতই নিমগ্ন থাকুতেন যে, জামার বোতাম, লাগাতেও ভুলে যেতেন অথচ সেই শিক্ষক কেরানি হওয়ার পর মন দিয়েছেন বহিরঙ্গের সাজে, এখন পোষাক পরেন অনেক পরিপাটি করে।

সাজ বদলেছে তার কিন্তু ভিতরে সদা জাগরুক তার শিক্ষকতার চরিত্র। অফিসে তাকে বেয়ারাদের সর্দার করে দেওয়ার পর কানাই, বিপিন, শীতলদের উপরে শুরু হয়েছে তার হেডমাস্টারি। তবে, তার এই পরিবর্তনের কথা কাউকে বুঝতে দিতে নারাজ। তাই নিরূপমের সাথে একান্তে কথা বলার সময় তিনি বলেন, একটি রিকোয়েস্ট, নিরূপম এসব কথা যেন গীতার মা, কি জেনারেল ম্যানেজাররের কানে না যায়!'

পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, দেশভাগের পর এপারে চলে আসার পরও প্রসন্নবাবু চেতনায় রয়ে গেছে সেই নীতিবোধ অন্তরের সারল্য, জটিল শহরে জীবন অভ্যস্ত হয়েও নৈতিকতা ধরে রাখার ব্যাকুল প্রয়াস।

আর একটি গল্প 'আসবর্ণী'তেও লক্ষ করি দেশভাগের অবশ্যাম্ভাবী কুফল। উদ্বাস্তু কালীমোহন চক্রবর্তী সপরিবারে ভাড়াটে হয়েছেন এক ধনী, শিক্ষিত যুবক প্রবীর ভট্টচার্যের বাড়িতে। কালীমোহনবাবু একটি ছোটো কোম্পানীর হেড সেলসম্যান। তার কন্যা অঞ্জলি সুন্দরী, অবিবাহিত কলেজে পড়ে। এরকম পটভূমিতে যা হয়ে থাকে কাছাকাছি আসতে চায় প্রবীর ও অঞ্জলি। কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যে আর্থিক ব্যবধান এতটাই যে, তাদের মধ্যে আলাপ পর্যন্ত হয় না।

কালিমোহন বাবুর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, কিন্তু আর্থিক দূরবস্থার কারণে বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম করতে হয় পোয়াতি স্ত্রীকেই। তাতে প্রতিবেশী কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে কালীমোহনবাবু বলেন 'ঝি তো রাখতে চাই, দিদি, কিন্তু পছন্দমত লোক পাওয়া যায় কই, যাকে তাকে রাখতে প্রবৃত্তি হয় না, দুটাকা বরং বেশি নেয় নিক, কিন্তু হাতের কাজটুকু পরিষ্কার হওইয়া চাই।'

কিন্তু গল্পের কেন্দ্রবিন্দু কালীমোহনবাবু নন, প্রবীর ও অঞ্জলি। প্রবীর শুধু অবস্থাপন্ন তাই নয়, তার চাকরিও বেশ উঁচুদরের। সে কোনও এক ইন্ডিপেনডেন্ট ইনভেস্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার। অঞ্জলি প্রবীরের বিত্ত, পদমর্যাদা বিষয়ে সচেতন, তারও ইচ্ছে প্রবীরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা, কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে অঞ্জলির সাহস হয় না প্রবীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে।

ইচ্ছে করেই একটা দুরত্ব বজার রাখে প্রবীরের সঙ্গে।

অঞ্জলির বাবা-মায়ের ইচ্ছে প্রবীরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে, কিন্তু তাঁদেরও সংকোচ আর্থিক ব্যবধানের কারণে। তবু সুযোগ পেলেই বলতে ছাড়েন না। অঞ্জলির যা রূপ, ওর যা রুচি, বিদ্যা-বুদ্ধি, তাতে বড়ো লোকের ঘরেই জন্মানো উচিৎ ছিল।' আবার কখনো বলেন 'অঞ্জলিকে যে নেবে সে ঠকবে না।' 'ওকে গরীবের ঘরে যেমন মানাবে, রাজার ঘরেও তেমনি।'

আসলে কালীমোহনবাবু সেলসম্যানের চাকরি করেন, তাই সেলসম্যানে কায়দাতেই বিবরণ দেন মেয়ের রূপ-গুণের যাতে প্রবীর বা তার পরিবার আকৃষ্ট হয় অঞ্জলির প্রতি।

দেশভাগের ফলে বহু স্বচ্ছল, এমনকী ধনী পরিবার ও পর্যবসিত হয়েছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে, তার পরিণামে কন্যাকে বিবাহপণ্য করতে বিজ্ঞাপন করতে হয় অসহায় পিতাকে। তাতে সফলও হন। প্রবীর আঙটি দিয়ে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয় অঞ্জলিকে। তবু শেষ রক্ষা হয়না, বিয়ের সব ঠিকঠাক, হঠাৎ কর্মক্ষেত্রে টাকা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন কালীমোহনবাবু, বিয়ে ভেঙে যায় তখনকার মতো। চরম আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ায় অঞ্জলিকে বন্ধক দিতে হয় প্রবীরের দেওয়া আংটি, কিন্তু সেই খবর প্রবীরের কানে গেলে খুব রুষ্ট হয় প্রবীর। তবু প্রবীরের মনে প্রেম অটুট, সে আর্থিক সাহাযও দিতে চায় অঞ্জলিকে, তবু তা প্রত্যাখ্যান করে অঞ্জলি। অথচ তাঁর কাঁধে এখন গোটা সংসার। তার উপর বেকার ভাই হাবুল জড়িয়ে পরে এমন এক ঝঞ্ঝাটে যার পরিণামে ধরা পরে সে। একের পরে এক বির্পযয় সংসারের প্রতিপালন, দুই বোনের ভরণ পষণ—সব মিলিয়ে অঞ্জলিকে চাকরি নিতেই হবে। শুনে প্রবীর তার অফিসে অঞ্জলিকে চাকরি দিতে গেলেও কিন্তু তা সে নেয় না।

আশ্চর্য এই অঞ্জলি চরিত্রটি। তার আত্মাভিমান এতই বেশি যে প্রবীর তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চাইলেও সে প্রত্যাখ্যান করে শুধু মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায় বলে। প্রবীরকে তখন ভারী অসহায় লাগে, সে বলে, 'হৃদয়ের কল্পনা আর নয়। এই একটি সাধারণ মেয়ের জন্য আমার সমস্ত দম্ভ, সমস্ত পৌরুষ নিঃশেষ কি একেবারে দেউল হতে হবে?' তার মনে হয় নারীর কাছে ভিক্ষা করেও প্রেম মেলে না!'

শেষে অঞ্জলি চাকরি পেয়ে রোজগারের টাকায় আবার সেই আংটিটা ছাড়িয়ে পড়িয়ে দেয় প্রবীরের আঙুলে, বলে, 'তোমার হাতেই থাক। ফের কোন মামলা মোকদ্দমা শুরু হল, আবার কখন বাঁধ পড়ে, আবার কখন বাঁধা পড়ি ঠিক কী!' সে এত কিছুর পরে ও বিয়ে করতে রাজি হয়না প্রবীরকে। তার তখনও মনে হয় তার মতো দীন ঘরের মেয়ের পক্ষে বিত্তবান প্রবীরকে বিয়ে করা ঠিক হবে না।

গল্পটা তার পরেই শেষ হয়ে যায়, পাঠক অনুভব করে, এ গল্প যেমন দেশভাগ- পরবর্তী একটি সংসারের দৈন্যের কাহিনি, তেমনি অঞ্জলির আত্মভিমানেরও।

আমরা আরেকটি গল্পে দেখি ওপার বাংলা থেকে আসা শিশির তাদের পরিবার নিয়ে উঠেছে বেলেঘাটার এক পুরোনো বাড়ির একতলায় তিনটি ঘর নিয়ে। তাদের এমনই সংগতি যে ইলেকট্রিক লাইট খারাপ হয়ে গেলেও তা সারিয়ে নিতে পারে না। হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার ছোটোবেলার বন্ধু বীরেনের—যে বীরেন খুবই শৌখিন।

শিশিরের তরুণী বোন চা করে নিয়ে আসে বীরেনের জন্য। সেই মুহূর্তে কারেন্ট চলে যাওয়ায় অরুণার হাতে হাত ঠেকে যায় বীরেনের, সেটাই তাদের প্রেম সৃষ্টি হওয়ার প্রথম মুহূর্ত। পরে জানা গেল কারেন্ট যায় নি, খারাপ হয়ে গেছে তাদের মেইনসুইচ। বীরেন ভার নেয় তাদের খারাপ হয়ে যাওয়া লাইন ঠিক করার। অফিস ছুটি নিয়ে সরমঞ্জামসহ কানাই নামে একটি লোককে নিয়ে আসে শিশিরের বাড়িতে। কানাইকে অন্য কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে বীরেন অরুণার হাতেই বাল্বটি দেয়। তাদের মধ্যে ভালোবাসা গাঢ় হয়ে উঠে।

তার কয়েকদিন পরে শিশির সিনেমার কয়েকটি পাস নিয়ে আসে - স্ত্রী ও বোনের সাথে বীরেনকেও সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অরুণার কাছ থেকে বীরেনের ঠিকানা নিয়ে শিশির আবিষ্কার করল বীরেন তাদের চেয়েও দৈন্যের মধ্যে থাকে, আসলে পেশায় সে নিজেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। অবশেষে, শিশির নিজেই আর উদ্যোগী হয় না অরুণার সাথে বীরেনের সম্পর্ক স্থাপনে।

পর পর কয়েকটি গল্পের রূপরেখা অনুধাবন করে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে কীভাবে ধরা পড়েছে দেশভাগের ফল।

আসলে সাতচল্লিশের দেশভাগ বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম সত্য। তার অনেকগুলো পর্যায় আছে যা নানাভাবে ধরা পড়েছে বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যিকদের লেখায়। যেমন— দেশভাগের আগে ও পরে হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, অপার বাংলা থেকে দলে দলে ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে সপরিবারে এপারে চলে আসে, আসার সময় স্বজন হারানো হেকে শুরু করে মেয়েদের উপর অমানুষিক অত্যাচার। এপার বাংলায় এসে শিয়ালদহ স্টেশনে দিনের পর দিনভিখারির জীবন যাপন করা, বহু পরিশ্রম ও খোঁজাখুঁজির পর মাথা গোঁজার জন্য একটুকরো জমি পাওয়া বা না পাওয়া, এ বাংলার নানা জায়গায় উদ্বাস্তুদের জমি জবরদখল ও ছোটো ছোট বাড়ি তৈরি করা, মাথা গোঁজার জায়গা পাওয়ার পর রুজিরোজগারের আশায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো, চরম দ্রারিদ্র্যের মধ্যে সাংসারিক নানা অশান্তি।

এরকম আরও বহু পর্যায় ছুঁয়ে এপার বাংলার মানুষদের মধ্যে এক সময় মিশে যায়। আমরা লক্ষ করি নরেন্দ্রনাথ মিত্র মূলত লিখেছেন শেষ দুই পর্যায় নিয়ে, সাংসারিক সমস্যা ও অশান্তি নিয়ে।

উল্লেখসূত্র:

১। 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা,' সত্যেন্দ্র রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা—২০০০, পৃষ্ঠাঃ ২৬৮।

২। 'বাংলা ভাগ ও মেয়েরা: বাস্তবে ও কথাসাহিত্যে, সম্পাদনা মণ্ডল, সোমদত্তা, হাজরা শুক্লা, বঙ্গ বিভাগ: সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিফলন', সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ কলেজ, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ১৭৯।

৩। 'মহানগর', ভূমিকা, নরেন্দ্র মিত্র, মুকুন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৩০ আগস্ট, ১৯৬৩।

৪। 'মহানগর', নরেন্দ্র মিত্র, মুকুন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৩০ আগস্ট, ১৯৬৩, পৃঃ৯।